চিরকুট ৩৪

এবারের বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে কয়েকটা পত্রিকা পড়ে মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠলো।সব কিছুতে কেমন যেন একটা হতাশার সুর। একটা পত্রিকা লিখছে – "অবরুদ্ধ স্বাধীনতা"। ছোট কাল থেকে দেখছি স্বাধীনতা আর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কেমন একটা অতৃপ্তির সুর – না পাওয়ার করুন রাগ। দেখতাম স্বাধীনতা বা বিজয় দিবসে প্রচারিত নাটকে একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার চরিত্র – পরাজিতের এক প্রতিমুর্তি। যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়ে বেশী চিন্তিত – তাদের বলি, যে দেশ স্বাধীন হয়েছে, তাকে তো আর কোন ভাবে পরাধীন করা যাবে না। সেটা যেমন ভৌগলিক ভাবে সম্ভব নয় –তেমনি সম্ভব নয় বর্তমান বাস্তবতার কারনে। যদি কেহ পাকিস্থানের পুর্বাবস্থায় ফিরে যেতে চায় তবে তাদেরকে ৩০ বৎসরের নীচের সকল বাংলাদেশীকে একটা যৌক্তিক কারন বুঝাতে হবে – এবং সেটা বর্তমানে অসম্ভব। আমরা পাকিস্থানী পুর্বাবস্থায় ফিরে গেলে আমাদের ভাল হবে এই বিষয়ে একটা ছোট বাচ্চাকেও কনভিন্স করা সম্ভব নয়। সুতরাং সে রকম চিন্তা যাদের মাথায় আছে সেটা তাদের মাথা-ই নিয়ে চলতে হবে বাকী কাল।

তাহলে প্রশ্ন আসে – স্বাধীনতা নিয়ে এত সংশয় বা হতাশা কেন? এর কারন আলোচনা করতে হলে আমাদের ১৯৭১ এর পুর্ববর্তী সময়ে কিছু সময় ফিরে যেতে হবে। বাঙালী জাতি স্বাধীনতার স্বপ্নের বিভোর বলে যে সময়টাকে আমরা চিহ্নিত করি – সে সময়টাতে সত্যিকার অর্থে কি সবাই স্বাধীনতার কথা ভেবেছে। অবশ্যই ভেবেছে – তবে সবার ভাবনা ছিল ভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্যে। যেমন – সাধারন মানুষের কাছে ছিল চালের দাম কমানো, ছোট পুঁজিপতিরা স্বাধীনতা জন্যে ব্যকুল ছিল – পশ্চিমা বড় পুঁজিকে তাড়িয়ে বড় পুঁজির মালিক হওয়া, ছোট আমলা দেখতো বড় বিহারী আমলার যায়গায় নিজেকে। সমস্যাটা সেখান থেকেই শুরু। স্বাধীনতার অর্থ বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম করে করেছে। যেমন – কেহ এটাকে দুর্নীতির স্বাধীনতা, কেহ বা নকলের স্বাধীনতা বা কেহ স্বেচ্ছাচারীর স্বাধীনতা হিসাবে নিয়েছে। ফলে স্বাধীনতার তিন দশক পরও আমাদেরকে একটা দক্ষ আর কর্মক্ষম প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্যে অপেক্ষা করতে হচ্ছে, একটা গনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে বহুবার আনন্দোলন করার পরও দেখতে হচ্ছে নকলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মতো একটা মুর্খতার সফলতায় বগল বাজাচ্ছে সরকার, নিয়ন্ত্রনের অভাবে ভেজাল নিম্নমানের পন্যে বাজার ভরা। বেকার যুবকের ঘর ভরা – আর বিনাবিচারে খুনের জন্যে তৈরী করা হচ্ছে বাহিনী – তাহলে স্বাধীনতার অর্থটা কি? যার যা ইচ্ছা করার স্বাধীনতা। স্বাধীনতার অর্থ কি পুলিশ ছিনতাই করবে, রাজকর্মচারীরা রা ঘুষ খাবে আর রাজনীতিকরা দেশের অর্থ পাচার করে বিদেশে সম্পদের পাহাড় গড়বে। সত্যি কথা বলতে কি, অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া যে কোন স্বাধীনতা মুল্যহীন। যদি সম্ভব হয় – বাংলাদেশে একটা দক্ষ আর প্রগতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা – যার ভিত্তি হবে সচ্ছতা আর জবাবদিহিতা – সেটার জন্যে কথা বলা দরকার। যদি সেটা কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় – তবে স্বাধীনতা আর অবরুদ্ধ থাকবে না। মৌলবাদী বা যৌগবাদী কেহই স্বাধীনতার ততটা ক্ষতি করতে পারবে না যতটা করছে তথাকথিত শিক্ষিত আর ভদ্রলোক – যারা টাই-স্যুাট পরেন আর ইংরেজী – বাংলা মিলিয়ে বড় বড় কথা বলেন।

(২)

দীর্ঘদিন যাবৎ নাস্তিকদের বিষয়ে একটা পড়ার মতো বই খুঁজছিলাম। অবশেষে পেলাম একটা, প্রবীর ঘোষ ও ওয়াহিদ রেজা সম্পাদিত, যাতে দু'বাংলার কয়েকজন যুক্তিবাদীর (?) লেখা সংকলিত হয়েছে। "দুই বাংলার যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্ম" উৎসর্গ করা হয়েছে ড. আহম্মদ শরীফকে। বলা হয়েছে তিনি হচ্ছেন নাস্তিকদের শ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী । বইএর প্রথম প্রবন্ধটি তাঁর লেখা। পড়তে পড়তে বিভিন্ন যায়গায় হোঁচট খেয়েছি। এতবড় মানুষ হিসাবে প্রচারিত একজন কিভাবে শুধু অন্ধ আবেগের উপর ভিত্তিকরে কিছু কথা লিখেন আর কিছু মানুষ তাকে দেবতা বলে সন্মানের সাথে তার লেখাকে বেদবাক্য বলে মনে করেন! আসুন তার লেখা দু'একটা বাক্য নিয়ে আলোকপাত করা যাক।

তিনি এক যায়গায় লিখছেন – *"নাস্তিক যুক্তিবাদী আত্নপ্রত্যয়ী আত্নমর্যাদাসচেতন বলেই সে অন্যায়-অপকর্ম থেকে বিরত থাকে।"* আর অন্য যায়গায় লিখছেন – *"প্রলোভন প্রবল হলে সেই সব আস্তিক মানুষ করে না এ হেন অপকর্ম জগতে নেই। "*(ড. আহমদ শরীফ – নাস্তিকরে ধর্মচিন্তা)। দেখুন প্রথম বাক্যটা – তিনি ধরে নিয়েছেন সকল নাস্তিকরা সৎ এবং কোন অন্যায় কর্ম করেন না। সমস্যা হচ্ছে এই দাবীর পক্ষে কোন পরিসংখ্যান দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এটা একটা বিশ্বাস – যা কোন যুক্তি বা প্রমান দিয়ে প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আর এক যায়গায় তিনি কমিউনিষ্টদের নাস্তিক বলে দাবী করেছে। যদি উনার এ দাবী সত্য ভলে ধরেনি – তবে রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ইয়েলেৎসিন (যিনি একসময় কমিউনিষ্ট ছিলেন) তার সম্পদের হিসাব তাকে সৎ মানুষ হিসাবে দাবী করার সুযোগ দিচ্ছে না। অন্যদিকে আস্তিক

মানুষ সম্পর্কে বলছেন "প্রলোভন" প্রবল হলে তারা এহেন "অপকর্ম" বাদ দেয় না। এ ধরনের দাবীর পক্ষে যৌক্তিক বা পরিসংখ্যানগত সত্যতা যাচাই সম্ভব নয়। তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার থেকে বলতে পারি বাংলাদেশে অফিস আদালতে এখনও যারা সৎকর্মী হিসাবে চিহ্নিত তাদের একটা বড় অংশ ধর্মীয় কারনেই সৎ। এখানেই প্রশ্ন থেকে যায়, যারা ড. আহম্মদ শরীফকে একজন দার্শনিক এবং পথ প্রদর্শক বলে মানেন তারা কি একটা প্রশ্ন করেছেন – স্যার, কেন আমরা আপনার উপরের দু'টা বাক্যকে সত্য বলে মেনে নেব? যদি উনি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক আর সৎ মানুষ বলে তার সকল কথা সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় তা হলে একজন নবী বা রসুল এর কথা সত্য বলে মানতে বাধা কোথায়? মজার বিষয় হলো পুরো প্রবন্ধের সকল কথাই আবেগ আর নিজস্ব বিশ্লেষনে ভরা, কোথাও যুক্তির গন্ধ খুঁজে পেলাম না। তবুও তারা যুক্তিবাদী (!) কারন তারা সাধারনের বাইরে গিয়ে অসাধারন কথা বলেন – আর যেহেতু তারা আস্তিকদের নির্বোধ মনে করেন – সেহেতু তারা যুক্তিবাদী।

ড. আহম্মদ শরীফের পুরো লেখাটায় এ ধরনের অনেক দাবী আছে যাতে বিশ্বাসীদের সম্পর্কে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে উনার ঘৃনার প্রবল বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় পক্ষান্তরে নাস্তিকদের বিষয়ে একটা অন্ধ আবেগ লক্ষ্য করা যায়। তারপর আসে – কেন নাস্তিকরা নাস্তিক সে বিষয়ে উনার নিজস্ব বিশ্লেষন। যেমন, তিনি কিছু প্রশ্ন করেছেন – "মানুষকে ও শয়তানকে কেন সৃষ্টি করা হল, মানুষকে কেন পাপ করার অধিকার দেওয়া হল, শাস্তিইবা দেয়া হবে কেন? তাতে কার কি উপকার বা লাভ? এসব প্রশ্নের উত্তর মেলে না।" যেহেতু তিনি এসবের উত্তর পাননি তাই তিনি নাস্তিক। তিনি বলছেন – "যুক্তিবাদী আত্মপ্রত্যয়ী সাহসী মানুষ মাত্রই তাই নাস্তিক নিরীশ্বর।"। আসলেই কি তাই? কিছু বিষয়ে না জানার বা জানতে ব্যর্থতাই কি তাহলে যুক্তিবাদ? কি জানি, হবে হয়তো? তাহলে বাংলাদেশের ৮০% মানুষ কিছুই জানেন না, তবে কি আমরা বলবো তারা সবাই যুক্তিবাদী। আরেকটু পরিষ্কার করে বললে বলতে হয়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভবে ব্যর্থ হয়ে তাঁর নির্দেশিত কিছু বিধি বিধান নিয়ে সংশয় প্রকাশ করাই কি নাস্তিকতা? না, তা হবে কেন? ধর্ম মানতে অনীহা বা ব্যর্থতা হবে ধর্মহীনতা। সেখানেই আমার সমস্যা। যখনই একজন নাস্তিক মানুষের সন্ধান পাই, কাছে গিয়ে দেখি সে একজন ধর্মহীন, সে ধর্মহীনতা বা ধর্মীয় বিধান পালনের অস্বীকৃতিকেই নাস্তিকতা হিসাবে চালাতে চাইছে। যেটা হাস্যকর। ইদানিং একজন পেয়েছি যিনি নাস্তিক হয়েছেন শুধু মাত্র ইসলাম ধর্মে মদ্যপান নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে। তিনি শেখ সাদীর বয়েত মুখস্ত করে মানুষকে শুনান আর সুরাপানের অতিপ্রাকৃতিক আনন্দে মশগুল থাকেন। আমার মতে, নাস্তিকদের উচিৎ অন্যে বিশ্বাস নিয়ে সংশয় প্রকাশ না করে নিজেদের "না" তত্ত্বটাকে প্রমান সহকারে নিয়ে আসা। বলা উচিৎ কেন তারা "ঈশ্বরের" অস্তিত্ব নেই বলে বিশ্বাস করেন। শুধু শুধু গোলযোগ সৃষ্টি না করে তাদের উচিৎ নিজেদের যুক্তির গভীরে গিয়ে দেখা, কেন তারা মনে করে একটা মহাশক্তির অস্তিত্বকে তারা অস্বীকার করবে।

(৩)

সাম্প্রতিক দু'টা মৃত্যু বিশ্বের – বিশেষ করে পশ্চিমা মিডিয়াতে প্রবল ঝড় তুলেছে। প্রথম মৃত্যুটা হচ্ছে – টেরি সাইভো'র আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে পোপ জন পল'র। দু'টা মৃত্যুর স্থান কাল ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে একটা বিশেষ সামঞ্জ্যতা আছে। এরা দু'জনই ভোগবাদী সমাজের অন্তস্বার শুন্যতাকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছেন।

প্রথমত আসি টেরির বিষয়ে। টেরি সাইভো দীর্ঘ ১৫ বৎসর শয্যাশায়ী থাকার পর আইনের কাছে পরাজিত হয়ে অনাহারে আর পানির অভাবে মারা গেছেন। আইন বলেছে তাকে খাবার আর পানি দিতে মানুষ বাধ্য নয় – সুতরাং তাকে দীর্ঘ তেরদিন খাবার আর পানি ছাড়া থেকে ধীরে ধীরে প্রানত্যাগ করতে হয়েছে। টেরির এ মৃত্যু যে বিষয়গুলো আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে সেগুলো হলোঃ

১) নৈতিক প্রশ্নঃ একজন মানুষ যখন নিজে খাবার যোগাড় খেতে পারবে না – তখন তাকে খাবার দেওয়াটা নৈতিকতার মধ্যে পড়ে কিনা? যখন একজন বিকলাঙ্গা বা মানসিক ভাবে অচল মানুষ পৃথিবীর – বিশেষ করে পুঁজির উৎপাদনের যন্ত্র হিসাবে যখন কাজে লাগবে না – তখন তাকে বাঁচানোর কোন প্রয়োজন আছে কিনা? ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ। কারন জীবন মানেই উপভোগ করা – সেখানে একজন শয্যাশায়ী মানুষের মুল্য খুবই কম। যদি তার বিশাল সম্পত্তির যথাযথ উইল করা থাকে বা দামী স্বাস্থ্যবীমা করা থাকে তবে সেটা ভিন্ন কথা। আর মানুষ সম্পর্কে ধর্মীয় মতবাদ যাতে চার্চের চার দেওয়ালের বাইরে না যেতে পারে তার ব্যবস্থা সংবিধান নামক একটা মানব রচিত কিতাবে নিশ্চিত করা আছে।

২) আইনী প্রশ্নঃ একজন মানুষের কোন মালিকানা থাকতে পারে কিনা? মানুষের মালিকানার প্রশ্ন তখনই আসে যার সাথে বিশাল অংকের টাকা জড়িত থাকে। পুরো ঘটনাটা আসলে ঘটেছে টেরির মালিকানা

(Ownership) নিয়ে। আইনগত ভাবে মাইকেল সাইবো বৈবাহিক সূত্রে টেরির মালিকানা পেয়ে যায়। সুতরাং কোর্ট মাইকেলের দাবীকে প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়। এখানে জন্মদাত্রী মাতা বা প্রতিপালক পিতা কিন্তু গৌন। যদিও মাইকেল গত দশ বৎসর একজন মহিলার সাথে বসবাস করছে যাকে আইনগত ভাবে বৈধ করার জন্যে বলা হয় কমন ল এবং যদিও তাদের ঔরসজাত দু'সন্তান আছে, কিন্তু ২১ টা কোর্ট সেই বিষয়টাকে প্রাধান্য না দিয়ে তার বৈবাহিক মালিকানাকে প্রাধান্য দিয়েছে। (বহু বিবাহ বৈধ করার একা বিকল্প হচ্ছে কমন ল) এখানে বলা প্রয়োজন যে, টেরির ভুল চিকিৎসার ক্ষতিপূরন হিসাবে প্রাপ্ত এক মিলিয়ন ডলার টেরির মালিকানার সমস্যার একটা বিশেষ দিক ছিল। যদি মাইকেল টেরিকে ডিভোর্স করতো তবে টেরির লিগ্যাল গার্জেন হিসাবে তার পিতা মাতা সে অর্থের মালিক হতো। মাইকেলের পক্ষে সেটা মেনে নেওয়া সম্ভব হতো না। যেখানে সে পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করে নতুন সংসার শুরু করেছে সেখানে তার পক্ষে এ অর্থ হাত ছাড়া করার থেকে টেরির মৃত্যু কামনা অনেক সহজ। এখানে বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, মাইকেল আইনের সুযোগে টেরিকে হত্যা করেছে।

৩) রাজনৈতিক প্রশ্নঃ আলট্রা কনজারভেটিবদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে যে রাজনৈতিক শক্তি ওয়াশিংটনের মসনদে তাদের ক্ষমতা যে কতটা সীমাবন্ধ সেটা তারা টের পেয়েছে। শুধু মাত্র কর্পোরেট পুঁজির তাবেদারী ছাড়া আর কোন বিষয়ে তাদের দৌড় যে শুধু মাত্র ওয়াশিংটন পর্যন্ত সীমাবন্ধ সেটা তারা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। যখন তারা দেখলো যে, তাদেরই তৈরী আইনের সহায়তায় একজন মানুষকে খাবার আর পানীয় না দিয়ে মেরে ফেরা হচ্ছে - তখন তারা আইন পরিবর্তন করে সেটা থামাতে চাইলো। কিন্তু তারা ব্যর্থ হলো। এখন আলোচনা শুরু হয়েছে - কোর্ট আর প্রশাসনের মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি কিভাবে করা যায়, কিভাবে প্রশাসনকে আরো ক্ষমতাশালী করা যায় এ সমস্ত বিষয়ে।

একজন সাধারন মানুষ হিসাবে একটা আমাদের বোধগম্য নয় - একজন আর্ত মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করতে কি পারতো না একটা বিশাল রাষ্ট্র? মাইকেলকে কি প্রশ্ন করা যেত না যে সে কিসের বলে টেরির মৃত্যু ঘটাতে চায়। সে কিভাবে জানলো টেরি এভাবে বাঁচতে চায় না? আর অন্যদিকে দেখি একটা সাধারন ঘটনাকে মিডিয়া কিভাবে অসাধারন বানায়। এ রকম টেরির মৃত্যু আমেরিকাতে কোন অস্বাভাবিক নয় - যেখানে চিকিৎসা ব্যবস্থা অত্যান্ত ব্যয়বহুল সেখানে একজন অথর্ব মানুষকে বাঁচানো জন্যে অপ্রয়োজনী অর্থ ব্যয় করার মতো বোকা মানুষের সংখ্যা সেখানে খুবই কম । ডারউইন সাহেব কি ছিলেন, সে বিষয়টা না জানলেও তার মতবাদের প্রয়োগের প্রমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রবল। বিশেষ করে যদি কোন ব্যক্তির কোন ভাল ইন্স্যুরেন্স করা না থাকে - তবে ডারইউন সাহেবের মতবাদ অনুসারে সে সারভাইভালের জন্যে ফিটেষ্ট তালিকায় থাকেন না। আরও দেখলাম প্রশাসনের ভন্ডামী। যারা সম্পূর্ন মিথ্যার উপর ভর দিয়ে ইরাকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এবং আমেরিকান দেড় হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্যে একটুকুও লজ্জিত না বা দুঃখিত না তারা শুধু মিডিয়া জয় করার জন্যে একটা তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিতে একটুকু কুন্ঠিত নয়। সবশেষে বলা যায় আমেরিকার মিডিয়ার বদৌলতে সমগ্র বিশ্ব দেখলো আইনের ছিদ্র দিয়ে কিভাবে একজন আর্ত মানব সন্তানকে ক্ষুধপিপাসায় তিলে তিলে মৃত্যুবরন করতে হয় আর মানবতা অসহায় ভাবে দর্শকের ভুমিকা পালন করে। মানুষের তৈরী আইন যে কতটা ত্রুটিপূর্ন হতে পারে তারও একটা উদাহরন হিসাবে এ ভয়াবহ দৃশ্যপটটা মানুষের মাঝে দেখা দিয়েছে। সম্ভবত তারই ফলশ্রুতিতে দেখলাম গত সপ্তাহে রোমে লক্ষ মানুষের সমাবেশ একজন ধর্মীয় নেতাকে বিদায় জানাতে।

সে প্রসংগ আসছে পোপের বিদায় উপলক্ষে। লক্ষ মানুষের সমাবেশ হয় তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যেখানে গিয়েছে ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী আর আমেরিকান প্রেসিডেন্ট। পোপের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে বিশ্বের প্রায় সব দেশের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান উপস্থিত থাকলেও এ দু'জনের নাম বিশেষ ভাবে বলার কারন হলো এদের দু'জনই ধার্মিক হিসাবে নিজেদের প্রচার করেন এবং পোপকে তাদের ধর্মীয় গুরু হিসাবে মানেন। কিন্তু তাদের সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে তাদের দু'জনকে পোপের কোন নির্দেশ পালন করতে তো দেখা যায়ইনি বরঞ্চ তাদেরকে পোপের নির্দেশ সরাসরি অমান্য করতে দেখা গেছে। যেমন ক্যানাডার প্রধান মন্ত্রী সরাসরি সমকামীদের বিবাহের বৈধতার পক্ষে যা খৃষ্ট ধর্মের রিরোধী এবং আমেরিকান প্রেসিডেন্ট পোপের নির্দেশ অমান্য করে ইরাকে যুদ্ধ করতে গেছেন। কিন্তু তবুও তারা ধার্মিক! শুরুতে এ কথাই বলছিলাম - মিডিয়ার ক্ষমতা এতো বেশী যে যে কোন সাধারন ঘটনা অসাধারন পর্যায় নিয়ে যায় যাতে ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রীকে তার কাছে মাথা নত করতে হয়। বলতে হয় - পোপ একজন মহা মানব ছিলেন, কিন্তু মনে মনে বলেন হয়তো - আমি তার কোন কথা মানি না।

পোপের মৃত্যু একটা বিষয়কে অবশ্য পরিষ্কার করেছে – আস্তিক মানুষের সংখ্যা না কমে কিন্তু বাড়ছে। বিশেষ করে তরুনদের মধ্যে ধর্মের প্রতি আকর্ষন লক্ষ্য করার মতো বিষয় ছিল।

(৪)

জনাব ফতেমোল্লা'র লেখা শারিয়া – ১ পড়ে বেশ ভাল লেগেছিল। কারন সেই লেখাটা ছিল বেশ তথ্য বহুল আর গবেষনা লব্ধ জ্ঞানের একটা প্রচ্ছায়া। পরে শারিয়া – ২ পড়ে ঠিক ততটা হতাশ হয়েছি। একটা কথা বলা দরকার, ফতেমোল্লার লেখার বিষয়ে কোন কথা বলার আগে বেশ সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন – কারন তিনি সব লেখা সবার জন্যে লেখেন না, পক্ষান্তরে তার সব লেখা সবার জন্যে প্রযোজ্য নয় – কারন সবার জ্ঞানের স্থর এক পর্যায়ে থাকে না। আমার ক্ষুদ্র মেধা দিয়ে যা বুঝলাম, শারিয়া – ২ লেখার সময় তিনি যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন না – আসলে তিনি কোন বিষয়টাকে সাবজেন্ট করে লিখছেন সেটা গুলিয়ে ফেলেছেন এবং এক পর্যায়ে তিনি গরু এবং নদী সংক্রান্ত গল্পের প্রসংগটা এনেছেন। যা তিনি অবচেতন মনে উপলব্ধি করতে পরেছেন। বলা বাহুল্য যে, শারিয়া হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের জন্যে প্রযোজ্য একটা বিষয় আর জামাতে ইসলামী হচ্ছে বাংলাদেশের একটা রাজনৈতিক সমস্যা। শারিয়ার কথা বলতে গিয়ে যদি জামাতের কথাই বেশী বলা হয় তবে আসলে জামাতকেই বেশী গুরুত্বপূর্ন করে তোলা হয় কিনা পাঠক একবার ভেবে দেখবেন। আমরা জানি তিনি জামাতকে বাংলাদেশের জন্যে একটা সমস্যা মনে করেন এবং জামাতকে পছন্দ করেন না। লক্ষ্যনীয় যে – বাংলাদেশের প্রায় ৯০% মানুষ জামাতকে ভোট দেয় না। সামপ্রতিক কালে বিএনপির কোলগ্রহ হয়ে টিকে থাকা জামাতকে অন্যান্য ইসলামী দলের টার্গেটে পরিনত করেছে। তিনি তার লেখার মাধ্যমে জামাতকে মহাসমস্যা হিসাবে দেখানোর মাধ্যমে কি আসলে জামাতকে তাদের প্রাপ্য গুরুত্বের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেন না? লেখার সময় এ বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখাটা জরুরী নয়কি, কোন ভাবে অপ্রযোজনীয় গুরুত্ব দিয়ে কাউকে প্রাপ্র আসনের উপরে বসানো হচ্ছে কিনা। ফতেমোল্লা কি আসলে "জামাতে পিছলামী" নামের ওয়েব সাইডে জামাতের বিরোধীতার আড়ালে প্রচ্ছন্নভাবে জামাতকে প্রম্পট করছেন কি না এই ধরনের প্রশ্ন যদি কারো মনে উদয় হয় তবে কি তাকে দোষারোপ করা যাবে?

(৫)

একটা ছোট্ট প্রসংগে কথা বলেই আজ বিদায় নেব। সৈয়দ হাবিবুর রহমান সাহেব আবার একটা অদ্ভুদ কাজ করে সবার দৃষ্টি আকর্ষনের চেষ্টা করেছেন। বিধাতার সংগে কথা বলার নামে তিনি কোরআনের ব্যবচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছেন। প্রথমেই তিনি বলছেন আরবী ভাষায় তার দখল নেই – কিন্তু পরে আরবী ব্যকরনের পান্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা করেছেন বেশ জোরশোরে। এটা মুক্তমনাদের জন্যে নতুন বিষয় নয়। যতটুকু মনে পড়ে মুক্তমনাদের স্বঘোষিত গুরু অভিজিৎ রায় একই ভাবে সুরা ফাতিহা নিয়ে আলোচনায় প্রমানের চেষ্টা করেছিলেন এবং বলছিলেন এগুলো ঐশী বানী নয়। মনে পড়ে আমাদের গ্রামের মুদি দোকানীর কথা। ভদ্রলোক কোনভাবেই বিশ্বাস করতেন না – চাঁদে মানুষ গিয়েছে। এবার দেখলাম একটা রহস্য পত্রিকার কপি তিনি রেখে দিয়েছেন – তাতে বিতর্ক হয়েছে – চাঁদে আসলে মানুষ কখনও পদার্পন করেছে কিনা? কি চমৎকার মিল আমাদের মুদিভাই আর মুক্তমনাদের মাঝে। ভাবছি মুদিভাইকে একটা পত্র দিয়ে "মুক্তমনা অব দি মানথ" হিসাবে সন্মানিত করবো। মুক্তমনাদের "বুঝি আর না বুঝি" পান্ডিত্য জাহির করাতে তাদের জুড়ি নেই। আর স্ববিরোধীতা – সেটাতো মুক্তমনাদের অলঙ্কার – বললেন আরবী জানেন না – কিন্তু ১৪০০ বৎসর আগের ভাষায় লেখা একটা বই এর গ্রামার নিয়ে প্রশ্নতোলার মতো নিবুদ্ধিতা করেও এরা লজ্জিত নন। কারন তারা তো মুক্ত – আর এ মুক্তি হয়তো লজ্জার থেকে মুক্তিও অর্ন্তগত। এখনেই আস্তিক আর মুক্তমনাদের পার্থক্য – আস্তিকরা যা জানে না তা নিয়ে বিব্রত থাকে আর মুক্তমনারা না জানাটাকে তাদের একধরনের যোগ্যতা মনে করে। এ ধারনা হয়েছে সাম্প্রতিক কালে মুক্তমনাদের লেখা পড়ে।

সবাই ভাল থাকুন।

আ. স. ম. জিয়াউদ্দিন
এপ্রিল ০৮, ২০০৫